ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২. ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

২. ৩. বাতিনী শীয়া সম্প্রদায়

ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি সন্ত্রাসী দল ছিল ‘বাতিনী শিয়া’ বা ‘হাশাশীন’গণ (Assassins)। শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ‘বাতিনী’ সম্প্রদায়। শিয়াগণ ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা ‘ইমামত’ বংশতান্ত্রিক বলে বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর পরে মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয়বিধ নেতৃত্ব আলী (রা)-এর প্রাপ্য ছিল। এরপর তা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই থাকবে। এ নেতৃত্ব বা ইমামতকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অনেক দল উপদল সৃষ্টি হয়েছে। অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করেন যে, আলী বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা’ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি) ‘ইমামত’ লাভ করেন। একদল মনে করে যে, জা’ফার সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এ ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

‘বাতিনীয়া’ সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর ‘বাতিনী’ বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে, ইসলামী ইলম দুপ্রকারের: যাহিরী ও বাতিনী।[1] তারা দাবি করেন, ইসলামের নির্দেশাবলীর দুটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ। এ অর্থ সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধিগণ জানেন। আর এ গোপন অর্থই ‘হাকীকত’ বা ইসলামের প্রকৃত নির্দেশনা। এ ‘হাকীকতের’ জ্ঞানই প্রকৃত মারিফত। শুধু সাধারণ জাহিলগণই যাহিরী বা প্রকাশ্য ইলম ও আমল নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ বা হাকীকত বুঝে মারিফাত অর্জন করেন এবং সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন।

এ মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীরা তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে মেনে নিতেন।

৩য়-৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ ‘কারামিতা’, ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীদের অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। হাশিশ বা ‘আফিম’ ও ‘গাজা’ জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার ছিল তাদের মৌলিক পরিচয়। এজন্য তারা ‘হাশাশীন’ নামে খ্যাত হয়।

এরা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে। আরবী ‘হাশাশীন’ শব্দ থেকেই ইংরেজী আssassin ও তৎসংশিষ্ট শব্দগুলি গুপ্ত হত্যা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত।

এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় ‘আল-মাওত’ নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত ‘ধর্মীয়-রাজনৈতিক’ আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এ সকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।[2]

আমরা দেখছি যে, খারিজীগণের ন্যায় ‘‘বাতিনী’’-গণের বিভ্রান্তির মূল ছিল ইসলামের নির্দেশনা বুঝার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের কর্মধারার গুরুত্ব না দেওয়া। তবে খারিজীদের সাথে এদের কিছু পার্থক্য আমরা দেখতে পাই:

(১) খারিজীগণ জিহাদের নামে সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ, অযোদ্ধা জনপদের উপর হামলা, হত্যা ও লুটতরাজ করলেও সাধারণত গুপ্ত হত্যা করত না। আলী (রা), মুআবিয়া (রা) প্রমুখের গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা ও আলী (রা)-কে গুপ্ত হত্যা করা ছাড়া অন্য কাউকে তারা গুপ্ত হত্যা করেছে বলে জানা যায় না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণের মূল কর্মই ছিল গুপ্ত হত্যা।

(২) খারিজীগণের কর্মকান্ডে আত্মহত্যা বা আত্মঘাতী হামলার কোনো ঘটনা দেখতে পাই না। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ নেতার নির্দেশে মৃত্যুবরণ করাকেই জান্নাতের পথ বলে বিশ্বাস করত, আত্মহনন বা অন্যের হাতে মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য করত না।

(৩) খারিজীগণ ইসলামী শরীয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ করত। এ বিষয়ে কোনোরূপ ছাড় দেওয়াকে কুফরী বলে মনে করত। পক্ষান্তরে বাতিনীগণ শরীয়ত পালন জরুরী বলে মনে করত না। বিশেষত নেতার নির্দেশে যে কোনো

শরীয়ত বিরোধী কর্ম করাকে বৈধ মনে করত।

(৪) খারিজীগণ কখনোই নিজেদের আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য গোপনীয়তা বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করত না। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মের কথা সুস্পষ্টভাবেই প্রচার করত। পক্ষান্তরে বাতিনী সম্প্রদায়ের কর্মকান্ডের ভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা ও মিথ্যা। তারা সর্বদা নিজেদের মতবাদ গোপন রেখে সমাজের মানুষদের সাথে মত, বিশ্বাস ও কর্মে একাত্মতা প্রকাশ করত। শুধু বাছাই করা মানুষদের কাছে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে দাওয়াত দিত।[3]

ফুটনোট

[1] আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, ইলমুল বাতিন বা বাতিনী ইলমকে যাহেরী ইলম থেকে পৃথক বা গোপন কোন বিষয় হিসাবে বর্ণনা করে যে সকল হাদীস প্রচলিত সেগুলি সবই বানোয়াট ও মিথ্যা। এগুলি বাতিনী শিয়াদের বানানো জাল হাদিস। এ বিষয়ক জাল হাদিস এবং সহীহ হাদীসে এ বিষয়ক কি নির্দেশনা আছে তা জানতে আমার লেখা “হাদীসের নামে জালিয়াতি” গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি। দেখুন হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৩৪৩-৩৪৯। আরো দেখুন, সুয়ূতী, যাইলুল মাউযূ'আত, পৃ: ৪৪, মুল্লা কারী, আল-মাসনূ'য় পৃ: ৯৩।

[2] আহমদ মুহাম্মাদ জলি, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক, পৃ. ২৬৫-৩০৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৯৮।

[3] বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ: একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6897

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন